আমি বেদনার্ত আমি আশাহত .. ..

অজয় রায়

চুক্তির ৩ (ক) ও (গ) ধারায় সই করে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ-বিচ্যুত হয়েছে নিশ্চিতভাবে। এছাড়া আহমেদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলমান ঘোষণার মৌলবাদী দাবীকে আওয়ামী লীগ নৈতিক সমর্থন দিয়েছে এক্ষং দেশে পাকিস্থানী ঢং-এ নতুন ব্লেসফেমী আইন চালুর রাস্তাকে প্রশস্ত করেছে। এটিও আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির বিসর্জন দেওয়ার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, "হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী' (৩ক)" - এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ পার্লামেন্টে বিল এনে, আইন করে নবীজীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুহম্মদ কী এতই দুর্বল হয়ে পড়েছেন? এটি একটি হাস্যকর প্রস্তাবনা। আমি অওয়ামী লীগের টপ নেতৃত্বকে খুব সিরিয়াসলি বিবেচনা করতে বলি কোন কাগজে সই করার আগে অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে দেখতে। জলিল সাহেব কতবার আপনাদের এধরণের হাস্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড় করাবেন ?

শুধুই কি বেদনার্ত আর আশাহত, আমি বিক্ষুব্ধও। জানি না, কোথা থেকে শুরু করব। বেগম খালেদা-মৌলানা নিজামী ৪ দলীয় গত ৫ বছরের আমলে বাংলাদেশ কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে– দুঃশাসনে ও অপশাসনে, দলবাজি ও দলীয়করণে, দুর্নীতিতে, সন্ত্রাসে, ধর্মীয় উন্মাদনা-সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টিতে, ধর্মীয়-এথনিক সংখ্যালঘু-আহমেদিয়া নির্যাতনে যে উচ্চ ও বহুমাত্রিক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তা পাঠক সমাজকে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। শুধু চেয়ে দেখেছি- মৌলবাদ আর সামপ্রদায়িকতার মাত্রা কত উচুতে উঠতে পারে, অথচ মুখে বলেছি বাংলাদেশে আমরা এশিযায় 'সামপ্রদায়িক সম্প্রতীর এক উজ্বল দৃষ্টান্ত' স্থাপন করেছি, সগর্বে ঘোষণা করেছি এদেশে আমরা সবাই বাংলাদেশী – এখানে সংখ্যালঘু সংখ্যগুরু বলে কোন কিছু নেই, অন্য দিকে জমি গ্রাস ও সম্পত্তি লুণ্ঠণের লোভে, আর নারী অপহরণ অপকর্মে একদল অসামাজিক রাজনৈতিক মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী যখন সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতায় আরুঢ় রাজনৈতিক দলগুলো ও সরকারী প্রশাসন নির্লিপ্ত থেকেছে। ডাকাতির নামে একের পর এক সংখ্যালঘু পরিবারগুলো আক্রান্ত হয়েছে, বাস্তচ্যুত হয়েছে, আদর্শ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে হাজার হাজার ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের তাদের আবাস থেকে বিতাড়ণ করা হচ্ছে, তখন খালেদা-নিজামী সরকার বাংলাদেশ একটি 'সামপ্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্বল মশাল' এবং 'বাংলাদেশ একটি মডারেট মুসলিম কান্ট্রি' – এই জয়নাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করেছে।

২০০১ সালে ক্ষমতায় আরোহনের পরদিন থেকে গত পাঁচবছর ধরে সদ্য বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী বিশাল জনসভায় তাঁর কর্ণপটাহ বিদারণী উচ্চপিচযুক্ত কণ্ঠে অহরহ এই ঘোষণা দিয়ে আসছেন যে, 'বাংলাদেশ একটি মডারেট মুসলিম দেশ' (a moderate Moslem country)। হিন্দু জাতিয়তাবাদী গয়েশ্বর-গৌতম-নিতাই গং কিন্তু তখন এর প্রতিবাদ করেন না, এমন কি মিন মিন করেও। কিন্তু ম্যাডাম যখন বলেন 'আমরা যার যার, ধর্ম তার তার; আমরা সবাই জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশী – এখানে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু বলে কিছু নেই,' তখন এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী গং 'দুর্গা মাই কি জয়ে'র সাথে সাথে 'ম্যাডাম মাই কি'র

জয়ধ্বনিতেও শান্ত বাতাসে ঝড়ের তরঙ্গ তোলেন। 'আমরা মডারেট মুসলিম' এই সার্টিফিকেটটি আমাদের দিয়েছিলেন জনৈক নিগ্রো মর্কিন রাষ্ট্রদূত বেশ কয়েক বছর আগে। আমাদের শাসকদের, শুধু শাসকদেরই বা বলি কেন – সমাজের অনেক রক্ষণশীল সুধীজনেরও, এই শব্দগুচ্ছ বেশ মনে ধরেছিল। মুসলমানও রইলাম আবার মৌলবাদী সামপ্রদায়িকতার দুর্গন্ধ গায়ে রইল না। স্যুট টাই পড়ে অথবা স্বচ্ছ শিফন পরিচ্ছেদ পরিহিতা উগ্রসাজ নিয়ে সহনশীল গণতন্ত্রী হতেও বাঁধা নেই, আর পাশাপাশি মুসলমানত্ব বজায় রাখতে কোন মানসিক দ্বন্দ্বের অবকাশও থাকে না। এ এক চমৎকার প্রশংসাপত্র। তবে, সহনশীলই হোক আর অসহনশীলই হোক গর্বের সাথে স্বীকার করে নেয়া হল যে বাংলাদেশ মুসলমানেদের দেশ। মার্কিন রাষ্ট্রদুত মনে হয় এদেশের শাসকদের ও এলিট মুসলিম সমাজের মন-মানসিকতা বেশ ভালভাবেই অনুশীলন করেছিলেন। ঐ রাষ্ট্রদূত সেখানেই থেমে থাকেন নি, মওদুদী-গোলাম আজম-নিজামীর জামাত ই ইসলামীকেও একটি চমৎকার সর্টিফিকেট ইস্যু করেছিলেন এই মর্মে যে, এটি 'গণতন্ত্রে বিশ্বাসী' (?) একটি রাজনৈতিক দল। অথচ জামাত কোনদিনই পশ্চিমী ধাঁচের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দর্শনে বিশ্বাস করে না – তাদের রাজনীতির দর্শন, ধ্যান ধারণা মওদুদী চিন্তাশ্রয়ী কোরান ও সুন্নাহ'কে আশ্রয় করে লালিত।

'বাংলাদেশ ইজ এ মডারেট মুসলিম কান্ট্রি' - এই বাক্যটি কী তাৎপর্য বহন করে? আমার মাথায় কুলায় না। যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী তাদেরকে সাধারণভাবে মুসলমান বা মুসলিম নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং মুসলিম দেশ বলতে বোঝাবে মুসলমানদের বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনগণের দেশ। এই অর্থেই কি বাংলাদেশকে মুসলিম দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়? অথবা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জন মুসলমান, তাই বাংলাদেশ কি একটি মুসলিম দেশ? অনেকের মতে কোন দেশ যদি মুসলিম আইন কানুন অর্থাৎ কোরান সুন্নাহ্ আর শরিয়তের আইন মোতাবেক শাসিত হয়, পরিচালিত হয়, তাহলে সে দেশকে মুসলিম বা ইসলামী দেশ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। যেমন পাকিস্তান – ইসলামিক রিপাবলিক, স্পষ্ট করেই বলা হলে যে এটি ইসলাম অনুসারীদের দেশ, এখানে অমুসলমানেদের স্থান নেই। অথবা যুদ্ধপুর্ব তালেবানী আফগানিস্তান। আমার বুদ্ধি বিবেচনায় আসে না কোন অর্থে আমাদের শাসকরা বলে থাকেন 'Bangladesh is a moderate Moslem country'। স্বাধীন বাংলাদেশ উত্তর জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাক সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে অভিহিত (রেফার) করত 'মুসলিম বাংলা' বলে। ৩০-৩৫ বছর পরেও আমাদের নব্য শাসকদের মন-হৃদয় থেকে এই 'পাক-প্রবণতা' দূর হয় নি। আদৌ কী হবে ? খালেদা বেগম, নিজামী আমিনীদের কথা বাদ দিন আমরা যে সব রাজনৈতিক শক্তি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদনগুলোকে সেক্যুলার বলে জানতাম, উদার গণতান্ত্রিক বলে মনে করতাম, সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবীত বলে মনে করতাম তারা কেন যেন ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে পড়ছে, আমাদের শেষ ভরসার স্থানগুলোও যেন হারিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি মুক্তিযুদ্ধ চেতনায় সমৃদ্ধ উদার গণতান্ত্রিক সেক্যুলার সোনার বাংলা, শেখ মুজিবের আবাল্য লালিত ধ্যান, আমদের স্বপ্নের জগতেই থেকে যাবে? সমাজতন্ত্রের কথা নাই বা উচ্চারণ করলাম। আমাদের কি শায়খুল হাদিস আজিজ, বাযতুল মোকাররমের খতিব, আমিনী-হাবিবুরদের কাছ থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নতুন ছবক নিতে হবে ? হা হতোস্মি।

আমি পূর্ব কথায় ফিরে যাই। বাংলাদেশ যদি 'মুসলিম কান্ট্রি' হয় তাহলে এখানে অমুসলমানরা স্বভাবতই থাকার অধিকার হারায়। এদেশে অমুসলমানদের সম অধিকার নিয়ে থাকার যোগ্য নাগরিত্ব থাকতে পারে না। বর্তমানে বাংলাদেশের কর্তিত সংবিধান সেই ইঙ্গিতই দেয়, যে সংবিধানের ললাটটে খোদিত আছে 'বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম ...', আর বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম .. '। তাহলে সংখ্যালঘু অমুসলমানেদের অবস্থান বাংলাদেশে বা বিশ্বের যে কোন মুসলিম কান্ট্রিতে কী হবে? এটি শুধু তত্ত্বীয় প্রশ্ন

নয়, বাংলাদেশের প্রায় দু'কোটি সংখ্যালঘুদের জন্য জীবন মরণের প্রশ্ন। বলা হয়ে থাকে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে কোন অমুসলমানই নাগরিকত্ব পেতে পারে না, তবে সেখানে তারা বসবাস করতে পারে রাষ্ট্রের জিম্মি হিসেবে, পবিত্র আমানত হিসেবে। জিম্মিদের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা দেখভাল করবে রাষ্ট্র, সীমিত আকারে ধর্মাচারের অধিকারও দেয়া যেতে পারে – কিন্তু সে রাষ্ট্রে অমুসলমনদের কোন উপাসনালয় নির্মাণ বা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে মদিনা সনদের রেফারেন্স টানা হয়, বলা হয়ে থাকে লা কুম দ্বীন অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমার, আরও বলা হয়ে থাকে 'লা-ইকরা ফি-দ্বীন' – 'ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই'। কিন্তু আমরা ভুলে যাই মদিনা সনদ সই করা হয়েছিল ইতিহাসের এক পর্যায়ে, একটি বিশেষ ক্রান্তি লগ্নে, তখনও ইসলাম বিজয়ী শক্তি জিসেবে আরবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সেটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল মদিনা রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যাতে সহ-অবস্থান করতে পারে তার একটি অস্থায়ী 'সমঝোতা চুক্তি' হিসেবে। মুহম্মুদের মক্কা বিজয়ের পরই ইসলাম প্রকৃত অর্থে আরবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তব রূপ নেয়। মদিনা সনদের সেখানে আর কোন স্থান ছিল না।

তবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থান এখনও ইসলামী রাস্ট্রগুলোর মত অতটা নৈরাশ্যজনক নয়। কারণ দেশটি এখনও সংবিধান অনুযায়ী 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' পাকিস্তানের অনুরূপ ইসলামী প্রজাতন্ত্র নয়। কর্তিত সংবিধানেও সকল নাগরিকের সম অধিকারের কথা বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ও আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের প্রতিশ্রুতি অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। এ কারণেই হয়তো বাংলাদেশকে মুসলিম কান্ট্রি বলা হলেও সামনে মডারেট বিশেষণটি বসানো হয়েছে, এটি বোঝাতে যে দেশটি মুসলমানদের হলেও উগ্র মৌলবাদী নয়। কিন্তু আমার হতাশা এই কারণে যে গত ৫ বছরের শাসনে খালেদা-নিজামী দেশটিকে উগ্র মৌলবাদী বানিয়ে ছেড়েছে, যা আমরা উদার গণতান্ত্রিকতার অনুসারীরা প্রতিরোধ করতে পারি নি। এখানেই আমার বেদনা। ৪ দলীয় জোটের প্রত্যক্ষ মদতে আর প্রশ্রয়ে উগ্র মৌলবাদী শক্তির উত্থান ঘটেছে যারা উদার গণতান্ত্রিক সেক্যুলার বাংলাদেশের অস্তিত্বের হুমকি স্বরূপ। জামাতসহ এই উগ্র মৌলবাদীর একটি অংশ বি.এন.পি'র কোলে বসে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদারিত্ব নিয়েও খুশী হয় নি, তারা স্পর্দ্ধার সাথে আমাদের জাতীয় পতাকা, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, আমাদের সংবিধান বদলিয়ে ইসলামী হুকমত কায়েমের ঘোষণা দেয়। আমাদের সংবিধান, প্রশাসন, শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থাকে অর্থাৎ পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থাটিকে তাগুতী আখ্যা দিয়ে এই মৌলবাদী উগ্র শক্তি সন্ত্রাসী পথে কোরাণ-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। তাদের আদর্শ তালেবানী আফগানিস্তান, যাদের শ্লোগান ছিল 'বাংলা হবে তালেবান'। আমার অনেক বন্ধু অবশ্য জামাতের সাথে বি.এন.পির রাজনৈতিক দর্শনের কোন পার্থক্য খুঁজে পান না, দুটিই 'ইসলাম পসন্দ মৌলবাদী' দল, তফাৎ কেবল বহিরাবনে। টপ বি.এন.পি নেতৃত্ব পড়তে ভালবাসেন ইউরোপীয় পোষাক, আর জামাতীদের পছন্দ আরবীয় ড্রেস। বি.এন.পি'র রাজনীতিতে সেক্যুলারিজম ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের স্থান নেই, মূল ভিত্তি ইসলামী রাজনৈতিক দর্শন তবে পশ্চিমী আবরনে। উভয় দলই একনায়কতন্ত্রের অনুসারী। এক কথায় উভয় দল পরস্পরের সম্পুরক। কিছুদিন আগে পল্টন ময়দানে ছাত্রশিবিরের সম্মেলনে জেনারেল জিয়া পুত্র তারেক রহমানের প্রকাশ্য ঘোষণা যে ছাত্রদল এবং শিবির একই মায়ের দুই ছেলে সমর্থন জুগিয়েছে যে জামাত ও বি.এন.পি মূলে এক।

অন্যদিকে এই মৌলবাদীদের আর একটি অংশ, বি.এন.পির কাছে তেমন গুরুত্ব না পাওয়ায় সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাথে গাটছরা বেঁধেছে। আমরা এতই দুর্বল হয়ে পড়েছি যে সেক্যুলারিজম ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে আওয়ামী লীগের মত ঘোষিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলকে শায়খুল হাদিস আজিজের 'খিলাফত মজলিসের' মত উগ্র মৌলবাদী একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে নির্বাচনে

জয়ী হওয়ার কৌশল হিসেবে 'সমঝোতা স্মারকে' সাক্ষর করতে হয় । অনেকেই বলেছেন, যারা অওয়ামী লীগের নিশ্চুপ সমর্থক, তারা মর্মাহত, এবং এই সমঝোতা সাক্ষর ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের পশ্চাদ অপসারণ । কিছুদিন আগে তারা বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বিসর্জন দিয়েছিল, আজ তারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে জিয়াউর রহমানের সংবিধান কর্তনকে জায়েজ করতে চায় ।

জনমনে, এবং আওয়ামী লীগের এক বিপুল সংখ্যক অনুসারীদের মনে প্রশ্ন জেগছে কী প্রয়োজনে এবং কোন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের এই প্রকাশ্য পদস্খলন ? তার আগে দেখা যাক এই ৩-দফা সমঝোতা স্মারকে কী আছে, যেটিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল, এবং খেলাফত মজলিশের পক্ষে খেলাফতের মহাসচিব জনাব আবদুর রব ইউসুফ সাক্ষর করেছিলেন ২তশে ডিসেম্বর তারিখে । এই স্মারক পত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, ৩-দফায় উল্লিখিত মোট ৫টি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে সমঝোতার ভিত্তিতে দুটি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে, এবং 'মহান আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করলে' তারা ঐ অঙ্গীকারাবদ্ধ বিষয়গুলো 'বাস্তবায়ন করবে' । বিষযগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি দফায় অঙ্গীকার করা হয়েছে যে,

(১) 'পবিত্র কুরআন সুন্নাহ্ ও শরীয়ত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না;
(২) কওমী মাদরাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতি যথায়তভাবে বাস্তবায়ন করা হবে' ।

৩ নং দফায় ৩টি বিষয় স্থান পেয়েছে (ক)-(গ) যার ওপর আইন প্রণয়ন করা হবে ঃ

(ক) 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ।
(খ) সনদ প্রাপ্ত হক্কানী আলেমগণ ফতওয়ার অধিকার সংরক্ষন করেন । সনদ বিহীন কোন ব্যক্তি ফতওয়া প্রদান করতে পারবে না ।
(গ) নবী-রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ও কুৎসা রটনা করা দণ্ডনীয় অপরাধ ।'

আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় শুধু আওয়ামী লীগ কেন যে কোন সত্যিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিতে বিশ্বাসী গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক দলের পক্ষে শুধু মাত্র কয়েকটি ভোটের জন্য একটি মৌলবাদী দলের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিকে জিম্মি রেখে লিখিতভাবে এ ধরণের নির্বাচনী সমঝোতায় উপনীত হতে পারে । আমার আরও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, আওয়ামী লীগ নেত্রী, যিনি নামের আগে বসাতে ভালবাসেন জননেত্রী অভিধা এবং তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী তাঁকে বঙ্গবন্ধুকন্যা নামে অভিহিত করতে ভালবাসেন, সেই শেখ হাসিনা এ ধরণের চুক্তিতে সই করাতে আবদুল জলিল'কে সবুজ সংকেত দিলেন । একবার ভেবে দেখলেন না যে এতে আওয়ামী লীগের অসংখ্য সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী কী পরিমাণ আঘাত পাবে, দেশের সেক্যূলার শক্তি কি ভাবে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, যে সেক্যূলার শক্তি আওয়ামী লীগের মেরুদণ্ড । বঙ্গবন্ধুকন্যা'র ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ৩৭-৩৮% ভোট পায় এর মুখ্য অংশই আওযামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ, উদার গণতন্ত্র ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের নীতির সমর্থক – এরা হল সাইলেন্ট সাপোর্টার, যারা অওয়ামী লীগের কাছে কোনদিন চায় নি যে জননেত্রী উপরোক্ত ইসলামী বিষয়গুলো, যে গুলো একান্তভাবেই ধর্মবিষয়ক ও ব্যক্তিবিশ্বাস নির্ভর, নিয়ে শায়খুল হাদিস আজিজের মত মৌলবাদীদের কাছে মুচালেখা দেবেন ।

আওয়ামী লীগ ভাবছে এই চুক্তি হল নির্বাচন জেতার কৌশল, অন্যদিকে মৌলবাদীরা ভাবছে খাদে পড়া আওয়ামী লীগকে ইসলামী দলে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপ হল এই সমঝোতা স্মারক- ধর্মনিরপেক্ষ দলটিকে ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সরিয়ে আনা গেছে অনেকটা। আর অওয়ামী লীগ বলছে যে, এই সমঝোতা হল ধর্মনিরপেক্ষতার বিজয়, কারণ কট্টর মৌলবাদী দলটি নাকি স্বীকার করেছে যে বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শ সঠিক। দু'দলই ভাবছে কৌশলগত বিজয় তাদেরই হয়েছে।

দেশে বিদেশে প্রতিক্রিয়া

যেখানে দেশে-বিদেশে সেক্যূলার গণতন্ত্রমনা বাঙালীরা এই চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করছে. যে চুক্তিতে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পদস্খলন ঘটেছে বলে তারা মনে করছে, সেই প্রেক্ষিতে টপ আওয়ামী নেতৃত্ব এই বিষয়টিকে কী চোখে দেখছেন তা দেখা যাক। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সঙ্গী অপর ১৩টি দল এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে – তাদের মতে এই নতুন সমঝোতা ১৪ দলের ২৩ দফা কর্মসূচীর সাথে সঙ্হতিপূর্ণ নয়। ১১দল, জাসদ ও সিপিবি তাদের বিরূপ মনেভাব ও ক্ষোভ প্রকাশ করে সমঝোতা স্মারককে মুক্তিযুদ্ধেও চেতনা ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন। ১১দল বলেছে যে 'এই চুক্তি এ দেশকে তালেবানি রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেবে', এবং চুক্তিটি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে বলে ১১দলের নেতৃবৃন্দ মনে করেন। সিপিবি অপরদিকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে যে চুক্তিটি শুধূ দেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি ও জনগণকে হতাশ করেনি, তা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেও ভূলুণ্ঠিত করেছে (প্রথম আলো, ২৫শে ডিসেম্বর)। বিদেশে অবস্থানরত সেক্যুলার বাঙালীরা তীব্র ভাষায় এই চুক্তির নিন্দা করেছে আর আওয়ামী লীগের নীতি ভ্রষ্টতায় বিষন্ন হয়েছে, ক্ষুব্ধ তো বটেই। তাদের ক্ষেভের একটু নমুনা তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না [১]ঃ

> In short, if implemented, AL is set to establish something like the infamous Pakistani Blasphemy Law in Bangladesh, if they get elected. AL has signed a deed with a jingoist Islamic party whose followers on Dhaka's streets once shouted, "amra hobo Taliban, Bangla hobe Afghan" (We shall be Taliban, Bangla will be Afghan). The same gang has led agitations demanding that Quadiyanis be declared non-Muslims. Their hatred for secular and political ideology has never been a hidden agenda in Bangladesh. This agreement will put the nation on an irreversible course to darkness.
>
> We urge the AL to annul the agreement immediately, urge the partners of the AL to stand up for the cause of secularism .. The nation deserves better.

সুশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া

দেশের বরেন্য বুদ্ধিজীবীরা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা নানা ভাবে এই চুক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ও বিরোধিতা প্রকাশ করছেন- বিবৃতি দিয়ে, কলাম লিখে, সংবাদপত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ২২শে ডিসেম্বর দেশের ৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক অনিসুজ্জামান, অধ্যাপক অজয় রায় এবং সুলতানা কামাল এর বিরোধিতা করে এই সমঝোতাকে আত্মঘাতী আখ্যায়িত করেছেন। সেক্যুলার গণতন্ত্রের জন্য এটি একটি মারাত্মক আঘাত যা আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কেই প্রত্যাশা করা যায় নি (প্রথম আলো, ২৫শে ডিসেম্বর)। একজন বিক্ষুব্ধ কলামিস্ট পরম ক্ষোভে লিখেছেন, "কোন জলিল-শোয়খুল চিরতরে বাঙালিকে ধ্বংস

---

[১] Mukto-Mona's Protest : Where is Awami League heading toward? (www.mukto-mona.com)

করতে পারবে না। চিরজীবী হওয়ার জন্যই – এ দেশটির আবির্ভাব। হাসিনা-জলিলের আত্মহননের মানে বাঙালির পরাজয় নয়।" (সংবাদ ৩০শে ডিসেম্বর)

একটি প্রেস বিবতিতে সুশীল সমাজের শীর্ষস্থানীয় শতাধিক প্রতিনিধিরা এই সমঝোতা'র বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন, '.. ৫দফা চুক্তি স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী' তারা এটিকে মুক্তবুদ্ধি, উদারনৈতিকতা, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী বলেও আখ্যায়িত করেছেন। (সংবাদ ২৬শে ডিসেম্বর)। এদের মধ্যে রয়েছেন মুক্তচিন্তার অধিকারী বলে খ্যাত দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীরা – অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক খান সারওয়ার মুর্শিদ, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক অজয় রায়, ড. হায়াৎ মামুদ প্রমুখ।

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু এবং ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ইউ.কে অল পার্টি হিউম্যান রাইটস গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান লর্ড অ্যাভেবারি এই চুক্তির সমালোচনা করে বলেছেন যে এই চুক্তি গণতন্ত্রের জন্য দুঃসংবাদ। তাঁর মতে আলেমদের ফতোয়া প্রদানের অধিকার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের প্রণীত আইনকে পদদলিত করবে। সেই সাথে ব্লেসফেমি আইনের প্রতিশ্রুতিকে তিনি একটি পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ বলে মনে করেন। এই ধরণের আইন ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের জন্য হুমকি স্বরূপ।

তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রশমিত করতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জলিল আওয়ামী লীগ ও খেলাফত মজলিশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে চুক্তি বলতে নারাজ, তাঁর ভাষায় এটি একটি নির্বাচনী 'সমঝোতা স্মারক' মাত্র। অনেকটা হাল্কা চালেই তিনি বিষয়টিকে উত্থাপন করেছিলেন। জনাব জলিলকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় এতে তফাৎটা কি হল (What difference does it make ?)? এই তথাকথিত 'সমঝোতা স্মারক' সাক্ষর করার ফলে অওয়ামী বিরোধী একটি চক্রকে আওয়ামী লীগকে সমালোচনা করার সুযোগ করে দেয়া হল, ফরহাদ মাজহার ও বদরুদ্দিন উমরের মত বুদ্ধিজীবীদের হাতে মোয়া তুলে দেয়া হল, অন্যদিকে সত্যিকার সেক্যুলার শক্তির, যার একটি বিশাল অংশ আওয়ামীলগের প্রতি সহানুভুতিশীল, হাতটি'কে অনেকখানি দুর্বল করে দেয়া হল – তাদের গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করা হল। আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে কত গভীরভাবে আহত হয়েছে ও আশ্রয়শূন্যতা বোধে বিক্ষত হয়েছে, আর কী পরিমাণ ক্রোধান্বিত হয়েছে তা কহতব্য নয়। অথচ আওয়ামী লীগকে সমর্থন দানের জন্য এই জনগোষ্ঠীকে কি পরিমাণ পাইকারী হারে বি.এন.পি ও জামাতী ক্যাডারদের হাতে নিষ্পেষিত হতে হয় তা আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের অজানা থাকার কথা নয়। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা কী এসব জানেন,- সেক্যুলারিস্টদের ও সংখ্যালঘুদের এই মর্মবেদনা কী আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ও টপ আঁয়ামী লীগ নেতৃত্ব সত্যিই অনুধাবন করতে পারেন? শেখ হাসিনা নিজেকে জননেত্রী মনে করেন, কিন্তু তিনি কি জনতার পালস্ বুঝতে পারেন না? আমার বিস্ময় জাগে। তা যদি বুঝতেন তাহলে এ ধরণের কোন চুক্তিতে আসতে পারতেন না। কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বরং যাথর্থ্য প্রমাণের জন্য ব্যখ্যার পর ব্যখ্যা দিতে হয়েছে, কিন্তু টপ লিডারশীপ এই সেক্যুলারশক্তিকে বা সংখ্যালঘুদের ডেকে তাদের বেদনা প্রশমিত করার কোন উদ্যোগ নেয় নি। পক্ষান্তরে মৌলবাদী শক্তিকে সম্প্রতি আওয়ামী লীগ যতটা তোয়াজ করছে, ইতোপূর্বে তা দেখা যায় নি।

এই চুক্তির ফলে একদিকে দেশের প্রভাবশালী সেক্যুলার উপাদান যেমন সংক্ষুব্ধ হয়েছে, তেমনি পক্ষান্ত রে দেশের মৌলবাদী শক্তি উল্লসিত হয়েছে এই ভেবে যে, ঐতিহ্যবাহী ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগকে

ধর্মের লেবাস পরানো গেছে; এরা ভাবতেই পারে নি যে, সেক্যূলারিস্ট ও বাহাত্তরের সংবিধান রচনাকারী আওয়ামী লীগ ফতোয়াদান'কে আইনসম্মত করতে স্বীকৃত হয়ে তাদের সেক্যুলার চরিত্রকে বর্জন করবে। মৌলবাদীরা এটিকে তাদের বিজয় বলে অভিহিত করেছে, শুধু তাই নয়, এই চুক্তি সম্পাদন মুসলিম উম্মার জয়। আওয়ামী লীগের এই নৈতিক পরাজয়, এবং আদর্শ বিচ্যুতি একদিকে ইসলাম পসন্দওয়ালাদের যেমন উৎসাহিত করেছে, তেমনি গণতন্ত্রমনা জনতার কাছে দুঃখজনক। খেলাফতের নেতারা এতেই সন্তুষ্ট নন্, তারা সদর্পে ঘোষণা করেছেন যে অন্যান্য ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের মত তাদেরও লক্ষ্য 'বাংলাদেশ একটি ইসলামী রাষ্ট্র' হবে। এমন একটি দলের সাথে আওয়ামী লীগ চুক্তি করতে পারে ভাবতেও অবাক লাগে। অন্যদিকে জামাতিরা এবং ৪-দলের সাথে থাকা খেলাফতের অন্য অংশটি এই চুক্তি সম্পাদনকে ইসলামের নামে ভণ্ডামী, পথভ্রষ্টতা ও নৈতক অধঃপতন বলে অভিহিত করেছে। তাদের মতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র নাস্তিকতার সমতুল্য- এই মতাদর্শের ধারকরা ইসলামের শত্রু।

আওয়ামী লীগের ব্যাখ্যায় কী আছে

দেশের সুশীল সমাজ, সেক্যুলারারিস্টরা, সাধারণভাবে সংখ্যালঘুরা এবং আওয়ামী লীগের জোট বন্ধুরা যখন এই অপ্রয়োজনীয় চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, তখন আওয়ামী লীগের পক্ষথেকে জনাব জলিল এই চুক্তির পক্ষে সাফাই গেয়ে একটি ব্যখ্যামূলক বিবৃতি দিয়েছেন। এবং আওয়ামী হাইকমাণ্ডের আশা এই বিবৃতি আমাদের সন্তুষ্ট করবে। এখন দেখা যাক ব্যাখ্যায় কী আছে। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে জলিল সাহেব জাতীয় জীবনে অপ্রভাবশীল একটি ইসলামী দলের ক্ষুদ্র অংশকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখেছেন এবং মনে করেছেন এই দলটির পেছনে এক বিপুল ইসলামী জন সমর্থক আছে যাদেরকে এই চুক্তির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের পক্ষে টেনে আনা সম্ভব। এটি একটি মিথ। যে বিশাল সংখ্যক মুসলিম জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় তারা আওয়ামী লীগ যে ধর্ম নিরপেক্ষ দল তা জেনেই ভোট দেয়। ধর্মনিরপেক্ষতার সার্টফিকেট নামসর্বস্ব জনসমর্থনহীন খেলাফত মজলিশের কাছ থেকে আওয়ামী লীগকে নিতে হতে পারে এটি একটি হাস্যকর ব্যাপার। কর্তিত সংবিধানেও বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া আছে, এর জন্য খেলাফতের একমত বা দ্বিমত হওয়ার প্রশ্ন আসে না। আর এই সমঝোতা স্মারকে কোথাও উল্লিখিত হয় নি যে খেলাফত মজলিস ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূল নীতি বা দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং জনাব জলিলের দাবী এই চুক্তির মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি বা ধর্মনিরপেক্ষতার বিজয় হয়েছে দাবী করা আমাদেরকে ধাপ্পা দেওয়ার সামিল। আওয়ামী লীগের জানা উচিত একটি সত্যিকার অর্থে ইসলামী দল কখনও সেক্যুলার উদারনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না, তাহলে তাদের আদর্শিক ভিতটিই চলে যায়। প্রতিটি ইসলামী দলের লক্ষ্য হল বাংলদেশকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র বানানো, যা শাসিত হবে কোরান ও সুন্নার অনুশাসনের ভিত্তিতে। খেলাফত পরিস্কার করেই একথা বলেছে আওয়ামী লীগের সাথে এই সমঝোতা একটি কৌশলগত পদক্ষেপ মাত্র।

জলিল সাহেব বলেছেন চুক্তিতে কোথাও 'ঈশ্বর নিন্দা প্রতিরোধী' বা ব্লাসফেমি (blasphemy) আইন চালু করার কথা বলা হয় নি। তিনি আমদের আশ্বস্ত করলেন বাংলাদেশে ব্লেসফেমী আইন নেই যা আছে তা ব্রিটিশ যুগের রেশ মাত্র এক্ষং ' .. ভবিষ্যতেও এ ধরণের কোন আইন করা হবে না।' জনাব আবদুল জলিল আবারও আমাদের নিরেট নির্বোধ ঠাওরালেন।

ব্লেসফেমি আইন কি

কারও ধর্মানুভূতিতে আঘাত, পারস্পরিক ধর্মদ্বেষ, নিন্দা ও অপপ্রচার থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ রাজত্বকালে একটি আইন প্রণীত হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজত্বেই এটি পরিমার্জিত হয় ১৯২৬ সালে।

বাংলাদেশে এই আইনের সংশোধন বা পরিমার্জন না হলেও, পাকিস্তানে এক সামরিক একনায়কের হাতে প্রথমে ১৯৮৬ সালে এবং পরে ১৯৯১ সালে ১৯২৬-সালের এই ক্রিমিনাল আইনের শরিয়তের আলোকে ইসলামীকরণ ঘটে, এবং পৃথিবীর ইতিহাসে ব্লেসফেমি আইন নিষ্ঠুরতম রূপ পরিগ্রহ করে। এই আইনের শিরোনাম হল : 'Offennses relating to religion : Pakistan Penal code'। বিভিন্ন ধরণের অপরাধের ফিরিস্তি ও শাস্তির নির্দেশসহ এই দণ্ডবিধিতে রয়েছে মোট পাঁচটি ধারা (২৯৫-বি ও সি, ২৯৮-এ,বি,সি)। ২৯৫-বি ধারাটি হল কোরাণের অবমাননা সংক্রান্ত যার সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ২৯৫-সি ধারটি হল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও নিষ্ঠুরতম। এটি পয়গম্বর হজরত মুহম্মদ'কে অপমান-অবমাননা বা তার সম্পর্কে অসত্য ও কুৎসিত উক্তি, প্রচারণা বা অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন সংক্রান্ত, – আর চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ২৯৮-এ ধারাটি মুহম্মদের স্ত্রী, তাঁর পরিবারের সদস্য, চার খলিফা এবং তাঁর অনুচরদের অবমাননার সাথে সম্পর্কিত; তাঁদের অবমাননা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। ২৯৮-বি ও সি ধারা দুটি কেবল মাত্র আহমেদিয়াদের জন্য প্রযোজ্য। এতে আহমেদিয়াদের স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে এবং তাদের মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এ দুটি ধারা পড়লে বোঝা যায় পাক শাসকেরা আহমেদিয়াদের ওপর কী পরিমাণ ক্ষিপ্ত ও অসহিষ্ণু।

গত কয়েক বছর যাবৎ জামাতসহ ইসলামপন্থী দলগুলো, যার মধ্যে শায়খুল হাদিস আজিজের খেলাফত মজলিশও রয়েছে, পাকিস্তানী মডেলে বাংলাদেশে 'ব্লেসফেমি আইন' প্রবর্তনের দাবী জানিয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে কয়েক বছর আগে সংসদে প্রদত্ত জামাত সাংসদ সাঈদির জ্বালাময়ী ভাষণের কথা মনে করতে পারি যেখানে তিনি প্রকাশ্যে নাম করে বলেছিলেন যে এ ধরণের ইসলামদ্রোহী ব্যক্তিদের শূলে চড়াতে হলে পাক-স্টাইলের ব্লেসফেমি দণ্ডবিধির প্রয়োজন। জনাব জলিল সাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ৩(গ) সংশ্লিষ্ট বিষয়টি কিন্তু বাংলাদেশে পাকিস্তানী মডেলের (২৯৫-বি,সি ও ২৯৮-এ ধারার) হুবহু ব্লেসফেমি আইন প্রণয়ণের সুস্পষ্ট অঙ্গিকার। জলিল সাহেব কাকে ধোকা দিতে চান, নিজেকে, আওয়ামী হাইকমাণ্ড'কে, নাকি ধর্মপরায়ন আম জনতাকে?

জলিল সাহেবের ব্যাখ্য থেকে সুস্পষ্ট যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে 'নিষ্ঠুর ফতোয়া প্রদানকে' আইনগত স্বীকৃতি দেবে, তবে এই ফতোয়াদানী ব্যক্তিরা হবেন 'কোরআন ও ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ'। শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারাই উচ্চারিত হোক কোন সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে ফতোয়া দান করে তদানুসারে অপরাধীকে (?) শাস্তিবিধান একটি মধ্যযুগীয় বর্বরতা। জলিল সাহেবরা এই চুক্তির মাধ্যমে আইন করে ও ফতোয়াপ্রথাকে রাষ্ট্রিয় স্বীকৃতি দিতে চান ভাবতেও আমার অবাক লাগে। কোন আধুনিক রাষ্ট্রে এ ধরণের প্রথা টিকে থাকতে পারে ভাবাই যায় না। নারী জাতির অবমাননাকারী এ প্রথা রোধ করতে হলে চাই কঠোর রাষ্ট্রিয় আইনে ফতোয়দানকারীর বিরুদ্ধে শাস্তি দানের ব্যবস্থা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক প্রতিরোধ।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তা কওমীই হোক আর আলিয়া মাদ্রাসাই হোক আমাদের সমাজ জীবনে এক বোঝা স্বরূপ। হঠাৎ করে সরকারী নির্দেশে এখান থেকে বেড়িয়ে আসা ছাত্রদের সনদ দিলেই সমস্যার সমাধা হয় না। এটি একদিকে একাডেমিক সমস্যা অন্যদিকে এসব শিক্ষার সাথে জীবন ও উৎপাদনের সাথে সম্পর্কের বিষয় সংশ্লিষ্ট। একই পদ্ধতির সার্বজনী সেক্যুলার গণমুখী একটি মাত্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এই

ধর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির শিক্ষাকে আধুনিক ও একাডেমিক দিক থেকে অঙ্গীভূত করার মধ্যে নিহিত আছে সার্বিক সমস্যা। বিগত সরকারের অসৎ উদ্দেশ্যে তারাহুরা করে কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের সনদ দানের সিদ্ধান্তকে চুক্তির মাধ্যেমে জায়েজ করার অঙ্গিকার করে জনাব জলিল আহমেদ একটি জটিল সমস্যাকে আরও জটিলতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। আগের সরকারের অবিমৃষ্যকারিতার দায় আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছায় কেন নিজ কাঁধে তুলে নেবে?

আবদুল জলিল তাঁর ব্যাখ্যায় ৩(ক) ও (গ) সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা সকল ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণীয় নয়। ব্যক্তিগত স্তরে আওয়ামী অ-আওয়ামী নির্বিশেষে যে কোন মুসলমান চুক্তিতে উল্লিখিত বিষয় দুটিকে তার বিশ্বাসের অঙ্গ ভাবতেই পারে, কিন্তু তার সাথে সেক্যুলার রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে দলীয় ও রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে টেনে এনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ঠিক কাজ করেন নি। বক্তব্যের শেষ অংশে এসে জনাব জলিল দৃঢ়তার সাথে বলতে চেয়েছেন যে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূল স্রোত থেকে আওয়ামী লীগ তার আদর্শ ও নীতি থেকে কখোনই পিছপা হনে না । এই বক্তব্যের সাথে খেলাফতের সাথে চুক্তিতে সাক্ষরদান – দুটি বিষয় পরস্পর বিরোধী। এই চুক্তি সম্পাদন করে আওয়ামী লীগ তার চারদিকে একটি ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের একটি স্বচ্ছ অবস্থান নেবার সময় এসে গেছে।

সেক্যুলারিজম থেকে কি আওয়ামী লীগের পদস্খলন ঘটেছে?

আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগের সত্যিই সেক্যুলার গণতন্ত্র থেকে পদস্খলন ঘটেছে। এই চুক্তি সাধন তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত। চুক্তির ধারাগুলো পরীক্ষা নীরিক্ষা করলে যে কোন সাধারণ মানুষের কাছেও ধরা পড়বে। আমাদের বাহাত্তরের সংবিধানে সেক্যুলারিজম'কে চারটি রাষ্ট্রিয় মূলনীতির একটি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল – এর বংলা প্রতিশব্দ ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। বিস্তারে যাবার আগে, আধুনিক দৃষ্টিতে সেক্যুলারিজম কী তার একটি সরল সংজ্ঞা জেনে নেয়া যাক।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গ এলেই আওয়ামী লীগ জড়সর হয়ে রক্ষণাত্মক অবস্থান নিয়ে (appologitically) এক নিঃশ্বাসে বলে ওঠেন, যা আবদুল জলিলের মন্তব্যে প্রতিধ্বণিত হয়েছে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, আমাদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।' এটুকুই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, সামান্য খণ্ডিত অংশ মাত্র। এভাবে দেখা হল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু বিষয়টিকে হ্যাঁ-বাচক দৃষ্টিতে উত্থাপন করতে হবে। আর, ধর্মনিরপেক্ষতা তো শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপার নয়, এটি একটি ইতি বাচক দর্শন, যার সাথে ধর্মহীনতা বা নাস্তিকতার যোগসূত্র সামান্যই।

সেক্যুলারিজম (secularism) শব্দের কাছাকাছি বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে অনেকে ইহজাগতিক বা লোকায়ত শব্দ ব্যবহারে করেন। আমি এখানে ইংরেজি শব্দটিই ব্যবহার করব। পুনঃপুন রাজনৈতিক অপব্যবহারের ও অপপ্রচারের কারণে মৌলবাদী ও বি.এন.পি পন্থী জাতিয়তাবাদীরা এর অর্থ দাঁড় করিয়েছেন 'নিরীশ্বরবাদিতা বা নাস্তিকতা' (atheism)। এটি ঠিক নয়। এ দুটি ধারণার (concept) মধ্যে দর্শনগত অর্থ-ভিন্নতা রয়েছে এবং দুটিকে এক করে দেখাও হয় না। আমরা এর দার্শনিক আলোচনায় না গিয়েও বলতে পারি যে 'নিরীশ্বরবাদিতা' (atheism) হল এমন একটি মতবাদ যা কোন ধরণের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না (a doctrine of disbelief in the existence if God); অন্যদিকে সেক্যুলারিজম (secularism) ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না, ইহজগতের বিষয় নিয়েই

তার অনুশীলন ও অধ্যয়ন (any 'ism' pertaining to the present world or to things not spiritual; the belief that the state, morals, education etc. should be independent of religion) ।

এর সোজা অর্থ হলো অর্থাৎ রাষ্ট্র সর্বদা একটি বিশ্বাসনিরপেক্ষ অবস্থানে থাকবে, কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা ঝোঁক প্রদর্শন করবে না । ধর্ম হবে নাগরিকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস – রাষ্ট্রের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই । কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস রাষ্ট্রীয় বা সরকারী কর্মকাণ্ডেও প্রতিফলিত হবে না, বা প্রভাবিত করবে না । অর্থাৎ রাষ্ট্রিয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ধর্মের কোন স্থান থাকবে না । রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা সকলের কাছে অবাধ, কোন বিশ্বাসের নিরিখে তা বিচার্য নয়, এবং রাষ্ট্রীয় আইনে সকল নাগরিক সমান । এটিই হল সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার মূল নীতি । আর সেই রাষ্ট্রের নাগরিকরা পরস্পরের মত ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে । এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই ইহজাগতিক বা সেক্যুলার সিসটেম ।

এর অর্থ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দেয়া নয়, বরং সকল নাগরিক যেন অবাধে স্ব স্ব ধর্মাচার পালন করতে পারে তার গ্যারান্টি রাষ্ট্র দেবে, যেমনটি বহাত্তরের সংবিধানে সকল ধর্ম পালনের নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে । বস্তুত সেক্যুলারিজম এমন এক সমাজের কথা বলে যার মূলে রয়েছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই দর্শন । 'মানবতাবাদ', বহুত্ববাদিতা (pluralism), বৈচিত্র্যময়তা (diversity) এবং যুক্তিবাদ এই সমাজের বৈশিষ্ট্য । আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে যেমন সেক্যুলারিজম বা ইহজাগতিকতার অধিষ্ঠান চাই, তেমনি আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থাসহ সমাজের সর্বস্তরে তার প্রতিফলন দেখতে চাই ।

এ কথা প্রেক্ষাপটে রেখে 'পবিত্র কুরআন সুন্নাহ ও শরীয়ত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না' – এই অঙ্গিকার করে আওয়ামী লীগ সুস্পষ্টভাবে একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও অনুরাগ প্রদর্শন করেছে । ফলে আওয়ামী লীগ সেকুলারিজমের পথ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে । কোন সেক্যুলার রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী নাগরিকের জন্য এই বিশেষ আনুকুল্য দেখাতে পারে না, কারণ এতে অন্যধর্মাবলম্বী নাগরিককে সম অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় । কেননা একটি আদর্শ সেক্যুলার রাষ্ট্র সকল ধর্মকেই একই দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য । জলিল সাহেবের দৃষ্টিতে দেখা ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণ করলেও তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হিন্দু পণ্ডিতদের সাথে, খ্রীস্টিয় পাদ্রীদের সাথে, এবং বৌদ্ধ সন্নাসীদের সাথে যথাক্রমে 'পবিত্র বেদ-বেদান্ত-গীতা ও হিন্দুধর্মবিধি বিরোধী', 'পবিত্র বাইবেল ও খ্রীস্টিয়ধর্মচার বিরোধী' এবং 'ত্রিপিটক ও বৌদ্ধ অনুশাসন বিরোধী' আইন প্রণয়ন করা হবে না, এই মর্মে জনাব জলিলের আরও অন্ততঃ ৩-৪টি সমঝোতা স্মারক চুক্তি করা উচিত ছিল । পাঠক হাস্য সংবরণ করুন । আমি ডেড সিরিয়স । আরও প্রশ্ন রয়েছে, কোন আইনটি কোরান-সুন্নাহ-শরীয়ত বিরোধী আর কোনটি বিরোধী নয়, এটি কে সিদ্ধান্ত নেবে, নাকি তাগুতি সংসদ, কোন বিশেষ মোল্লা গোষ্ঠী, জামাত .. কে ? এখানে বলে রাখা ভাল যে চার্চের মত ইসলাম ধর্মে থিওলজিক্যাল কোন সেন্ট্রাল অথরিটি নেই ।

এবার ফতোয়া প্রসঙ্গ । চুক্তির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ অতি অপব্যবহৃত ফতোয়াবাজীকে একটি আইনগত সিদ্ধতা দেবার অঙ্গিকার করেছেন । বাংলার বিক্ষুব্ধ ও অত্যাচারিত নারীসমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আওয়ামী লীগ যার প্রধান একজন নারী । ফতোয়া কী ? ইসলামী দেশগুলোতে ফতোয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান (institution) । এটি ইসলাম অনুমোদিত একটি আইনসিদ্ধ ঘোষণা/সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ (legal pronouncement), যা দিতে পারেন একজন মুফতি, অর্থাৎ এমন একজন আলেম যিনি শরিয়া আইন (Islamic law) বিশেষজ্ঞ । সাধারণভাবে ফিক্কাহ্ (Islamic jurisprudence) বিষয়ে কোন সন্দেহ, সিদ্ধান্তহীনতা বা অনিশ্চয়তা দেখা দিলে কাজী বিচার কাজে সহায়তার জন্য ফতোয়া চাইতে

পারেন বা যে কেউ কোন ধর্মবিষয়ক জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে ফতোয়া চাইতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল ইসলামে কেন্দ্রীয় কোন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব না থাকায় ফতোয়া ইস্যু করার ব্যাপরে জটিলতা, পরস্পর বিরোধিতা এবং ব্যক্তিগত শত্রুতার শিকার হয়েছে অসংখ্য নিরীহ মানুষ, বিশেষ করে নারী সমাজ। ফতোয়াবাজীর অত্যাচারে নিপীড়িত হাজার হাজার নারীর করুণ কাহিনীর বিবরণ দিয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। সেক্যুলার বিচার ব্যবস্থায়, যেটি এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত, ফতোয়ার কোন স্থান থাকতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা যে কোন 'ইসলামী বা মুসলিম আইন বিষয়ক' বা যে কোন প্রজলিত আইন বিষয়ক প্রশ্নের সমাধানের সব ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বিচারালয়গুলিকে। যেহেতু ইসলামে নানা ধরণের তরিকা, সম্প্রদায় (sect) বিদ্যমান তাই একই ইস্যুতে পরস্পরবিরোধী ফতোয়া দেওয়া খুবই স্বাভাবিক, যা প্রায়শ সমস্যার সমাধান না করে পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। একথাও আমরা ভুলিনি যে, উচ্চ আদালতের রায়ে (১লা জানুয়ারী, ২০০১) সব ধরণের ফতোয়া আইনের দৃষ্টিতে কর্তৃত্বহীন ও অবৈধ; শুধু তাই নয়, ফতোয়াদানের কাজটিই হওয়া উচিত আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ফতোয়াদানের আইনগত স্বীকৃতি বাংলাদেশ 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির'ও লঙ্ঘন, যে নীতি ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের কালেই গৃহীত হয়েছিল নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ও ক্ষমতায়নের অঙ্গিকার নিয়ে। একটি সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দেশে ফতোয়া কখনও একটি বৈধ প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। এই কাউন্টেও আওয়ামী লীগ নীতিভ্রষ্ট হয়েছে- এধরণের চুক্তিতে সই করে।

চুক্তির ৩ (ক) ও (গ) ধারায় সই করে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ-বিচ্যুত হয়েছে নিশ্চিতভাবে। এছাড়া আহমেদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলমান ঘোষণার মৌলবাদী দাবীকে আওয়ামী লীগ নৈতিক সমর্থন দিয়েছে এক্ষং দেশে পাকিস্থানী ঢং-এ নতুন ব্লেসফেমী আইন চালুর রাস্তাকে প্রশস্ত করেছে। এটিও আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির বিসর্জন দেওয়ার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, "হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী' (৩ক)" - এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ পার্লামেন্টে বিল এনে, আইন করে নবীজীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুহম্মদ কী এতই দুর্বল হয়ে পড়েছেন? এটি একটি হাস্যকর প্রস্তাবনা। আমি অওয়ামী লীগের টপ নেতৃত্বকে খুব সিরিয়াসলি বিবেচনা করতে বলি কোন কাগজে সই করার আগে অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে দেখতে। জলিল সাহেব কতবার আপনাদের এধরণের হাস্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড় করাবেন ? আমি আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, ব্যক্তি মুসলমান হিসেবে যে কেউ 'মুহম্মদকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী' ভাবতে পারেন, এটি তার বিশ্বাস। কিন্তু আইন করে বা, সংবিধানে এই বাক্য অন্তর্ভুক্ত করে আপনাদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস প্রায় দুই কোটি অমুসলমান বাংলাদেশের নাগরিকের বিশ্বাসে পরিণত করাতে চান কেন? আমি মনে করি এই চেষ্টা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিকতা থেকে আওয়ামী লীগের রীতিমত পদস্খলন। কারণ মুহম্মদকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আখ্যা দিয়ে একটি বিশেষ ধর্মের অনুসারীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও অনুরাগ প্রদর্শন করা হল- এটি সেক্যুলারিজমের সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সেক্যুলারিমের প্রকাশ্য লঙ্ঘন। অথচ, জননেত্রী শেখ হাসিনা বড়দিনের আগের দিন একটি চমৎকার উক্তি করেছিলেন, 'বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ (ধ ংবপঁষধৎ ফবসড়পৎধঃরপ পড়ঁহঃৎু) (সংবাদ, ২৫শে ডিসেম্বর) অথচ তিনিই এই চুক্তি সম্পাদনকে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বিজয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন (সংবাদ, ৩০শে ডিসেম্বর) । এই বৈপরিত্য আমাকে পীড়া দেয়, আমার বেদনার শেষ নেই।